ভূমিকা

বলা যায় যেদিন থেকে মানুষের জন্ম, মানুষের আদিম ও বন্য জীবন তথা সমাজের শুরু, সেদিন থেকেই তার জীবন-নাটকেরও অভিনয় শুরু হয়েছে। নিজেকে অন্যের কাছে প্রকাশ করার মধ্যে সাহিত্যীয় অভিব্যক্তি রূপলাভ করে থাকে। কিন্তু মানুষ যে পদ্ধতিতে নিজেকে ব্যক্ত করেছে তা অনেখানি নাটকীয়; নিজের কথা বলতে বা নিজেকে প্রকাশ করতে সে একটা না একটা মাধ্যম গ্রহণ করে, ঐ মাধ্যমে একটা কিছুর অনুকরণে গড়ে তোলা। নিজের কথা বলতে মানুষ অন্যের কথার নকল করে থাকে আর এই নকল বা অনুকরণ স্পৃহা থেকেই নাটকের জন্ম। নাটক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিষ্পন্ন করলে দাঁড়ায়— নট + অক্ (তৃ) যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দৃশ্যকাব্য, নটের কার্য, অর্থাৎ যা রঙ্গভূমিতে অভিনয় করনোপযোগী গ্রন্থ, যার ইংরেজী অর্থ Drama।

বাঙালী নাট্যগত প্রাণ। এই নাট্যরস পিপাসা চরিতার্থতার জন্য সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাঙালী নাট্যচর্চা করে এসেছে। সেই সঙ্গে নাটক ও নাট্যাভিনয় নিয়ে চিন্তাভাবনাও করেছে। বাঙালী সংস্কৃতির উদ্ভব মুহূর্ত থেকেই 'নাটক' প্রসঙ্গের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাসঙ্গিক নিদর্শন চর্যাপদের মধ্যে আমরা তার পরিচয় পাই।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের নিদর্শন আমরা দেখতে পাই-প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাপদের ১১নং পদে। এই পদে যে বুদ্ধ নাটকের বর্ণনা আছে, এটি বাংলাদেশে প্রাচীনতম প্রাপ্ত নাটকের বর্ণনা। খ্রিস্টীয় নবম-দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধর্মের ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটে এবং আমরা এও জানি বৌদ্ধরাই তাঁদের ধর্মসাধনার অন্যতম মাধ্যম রূপে নাটককে অবলম্বন করেছিলেন। চর্যাপদের ১১নং পদে তাই দেখতে পাই— ''নাচন্তি বাজিল গাঅন্তি— দেবী/বুদ্ধনাটক বিষমা হোই। এখানে বুদ্ধনাটকের প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ, যা বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। পরবর্তীতে বাংলা নাট্য সাহিত্যের সূত্রপাত মূলত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্বেই ঘটেছে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত তা যাত্রারূপেই চলে আসছিল। প্রাপ্ত আঠারো শতকে মঞ্চের আশ্রয়ে গড়ে ওঠে বাঙালীর নাট্যচর্চা। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ২৭ নভেম্বর হেরামিস লেবেদফ নামে জনৈক রুশবাসী কলকাতার ডোমতলাতে (অধুনা এজরাষ্ট্রীট) রঙ্গালয় স্থাপন করে গোলকদাসকে দিয়ে 'দ্য ডিসগইজ' এবং 'লাভ ইজ্ দ্য বেসটডক্টর' নামে যে দুটি ইংরেজী প্রহসনের অভিনয় করিয়েছিলেন তা মঞ্চে অভিনীত নাট্যসাহিত্যের প্রথম নিদর্শন। বাংলা নাটক বা নাট্যাভিনয় ছিল বাঙালি সভ্যতার মতোই সুপ্রাচীন। অর্থাৎ বাংলাদেশের নাট্যচর্চার একটা রীতিমতো ঐতিহ্য ছিল। এই প্রসঙ্গে ড. বিষ্ণু বসু তাঁর 'বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটা: ১৭৯৫-১৯৪৪' গ্রন্থে যথার্থ মূল্যবান মন্তব্য করে বলেছেন—

''নাট্যশিল্পের ঐতিহ্য আমাদের দেশে গড়ে উঠেছে অন্তত দুহাজার বছর ধরে, ভারত মুনির 'নাট্যশাস্ত্রম' এবং ভাস কালিদাস ভবভূতির উত্তরাধিকার বর্তায় আমাদের উপরেও; কারো কারো মতে 'মৃচ্ছকটিক'-এর শূদ্রক ছিলেন বাঙালি, মধ্যযুগের বাংলায় লেখা হয়েছিল বেশ কিছু মিশ্রভাষার নাটক, চৈতন্যদেব স্বয়ং অভিনয় করেছিলেন একখানি পালায়, এমনকি আঠারো শতকেই ভারতচন্দ্র লিখতে শুরু করেছিলেন 'চণ্ডী' নাটকটি। তাছাড়া একথা বলাই যায় যে, রাজসভাকেন্দ্রিক নাট্য প্রযোজনা বিলুপ্ত হলেও যে ঐতিহ্য বেঁচে ছিল সমাজের বিবিধ ধরনের অভিনয়ের ধারার মধ্যে। যাত্রা, ঝুমুর, আলকাপ, গম্ভীরা, লোটো প্রভৃতি অজস্র ধরনের লোকনাট্য তা ধারণ করে রেখেছিল নিজস্ব শরীরে। এসব লোকজ উপকরণের সঙ্গে ইউরোপীয় ধাঁচের থিয়েটারের সম্মিলন ঘটিয়ে লিয়েদেভ নির্মাণ করেছিলেন তাঁর 'বেঙ্গলী থিয়েটার'। এর প্রায় অর্ধ শতক আগে কলকাতায় প্রবর্তন ঘটেছিল যে পাশ্চাত্য থিয়েটারের লিয়েবেদভ তার অন্ধ অনুকরণ করলেন না। আঙ্গিক রাখলেন বিদেশি, নাটকও ইংরেজি থেকে নেওয়া, কিন্তু তিনি ধাঁচটা তৈরি করতে চাইলেন একেবারেই এদেশি। তাই অভিনেতৃ-সম্প্রদায় সংগ্রহ করলেন যাত্রার দল থেকে, অভিনেত্রীরাও এলেন হয়তো বা ঝুমুরের দল থেকে, 'কাল্পনিক সংবদল' নামের মধ্যেও রয়ে গেল কলকাতার পরিচিত 'সং', নামের শিল্পটি এবং প্রযোজনায় যুক্ত হল বিদ্যাসুন্দরের গান। প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের মিলনে গড়ে উঠল যে আধুনিক থিয়েটার তা আমাদের সংস্কৃতির একটি সজীব ধারা হিসেবে প্রাণবান হয়ে রইল।''[১]

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবে লক্ষ করা যায় ইংরেজী কাব্য নাটকের আস্বাদন করে নব্য শিক্ষিত বাঙালীর কাছে তাঁর নিজস্ব দেশীয় সংস্কৃতি যাত্রা, কবি, পাঁচালী, খেউড, আখড়াই প্রভৃতি আমোদ প্রমোদগুলি যেন ঘৃণ্য ও অরুচিকর মনে হয়েছিল। সেকারণে তাঁরা ইংরেজের স্থায়ী, অস্থায়ী মঞ্চে অভিনীত নাট্যাভিনয়ে উপস্থিত থেকে সংস্কৃতিক ক্ষুন্নিবৃত্তি স্বাদ মেটাতে শুরু করেন। মোটকথা কলকাতায় ইংরেজ স্থাপিত রঙ্গমঞ্চগুলি শিক্ষিত বাঙালী হৃদয়ে অভিনয় স্পৃহা জাগিয়ে তোলো। এবং এই নব্য শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে ইংরেজি ধারায় নিজস্ব রঙ্গমঞ্চের অভাব প্রবলভাবে দেখা যায়। এরফলে শিক্ষিত বাঙালীরা তখন বাংলা নাটক রচনা ও মঞ্চাভিনয়ের জন্য উদ্যোগী হলেন। এবং ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ২৮ ডিসেম্বর নারিকেলগঙ্গার বাগানবাড়িতে প্রসন্নকুমার ঠাকুর কর্তৃক 'হিন্দু থিয়েটার' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই এই ধারার সূচনা হয়েছিল। মোটকথা এই 'হিন্দু থিয়েটার' বাঙালি প্রতিষ্ঠিত প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা। তবে এই নাট্যশালায় কোন বাংলা নাটকের অভিনয় হয়নি। প্রসন্নকুমারের পর শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু তাঁর বাড়িতে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে (বর্তমানে যেখানে শ্যামবাজারের ট্রাম ডিপোর অবস্থিত) ইংরেজি

ধরনের বঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেন। এই রঙ্গমঞ্চের বাঙালির উদ্যোগে বাংলা নাটকের অভিনয় হয়। এই রঙ্গমঞ্চে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ অক্টোবর 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয়।

এইভাবে কখনও ইংরেজি নাটক আবার কখনও বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ের মধ্যদিয়ে বাংলা নাটকের অভাব তীব্রভাবে বাঙালীর মধ্যে অনুভূত হয়। এ প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থে যে যুক্তি সঙ্গত অভিমত তুলে ধরেছেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য— ''বাংলা নাটকের অভাবে বাঙালী প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় ইংরেজী নাটকের অভিনয় হইত, কিন্তু সেগুলি জনপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। ইংরেজী নাট্যসাহিত্য যতই উচ্চাঙ্গের হউক না কেন, বাঙালী জনসাধারণের কথা দূরে থাকুক, ইংরেজী-শিক্ষালব্ধ বাঙালীর পক্ষেও সহজ ও স্বাভাবিকভাবে তাহার রসগ্রহণ একটু আয়াস-সাধ্য ব্যাপার ছিল। সুতরাং নাট্যাভিনয়ের উৎসাহ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির কিছু দিন পর্যন্ত্যও কৃত্রিমই ছিল। কিন্তু ঠিক এই সময়েই বাংলাদেশে নাট্যাভিনয় ও নাটক রচনার ধারায় একটা নূতনত্ব দেখা দিল।''[২]

সুতরাং নাট্যাভিনয়ের উৎসাহে এবং সহজ ও স্বাভাবিক ছন্দে রসাস্বাদনের উপযোগী নাটকের জন্য বাঙালির মধ্যে সৃজনী প্রতিভাও এই দশকেই দেখা দিতে আরম্ভ করে। তাই ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বাংলা মৌলিক নাটকের উদ্ভব হয়েছিল। জি.সি. গুপ্তের কীর্তিবিলাস এবং তারাচরণ শিকদারের ভদ্রার্জুন নাটক রচনার মধ্য দিয়ে। এই মৌলিক নাট্যসৃজনের ধারা অতিসত্ত্বর ত্বরান্বিত হয়ে বাংলা নাট্যসাহিত্যকে বহুমুখী নাট্যরচনায় সমৃদ্ধ করে তুলেছিল।

ব্রিটিশ শাসনকালে অবিভক্ত বাংলার ইউরোপীয় ধাঁচের প্রসেনিয়াম ভিত্তিক নাট্যচর্চার প্রাণকেন্দ্র কলকাতা দিনাজপুরকেও আন্দোলিত করে তুলেছিল। অর্থাৎ কলকাতায় প্রথম নাট্যশালা ও নাট্যসমাজ গঠিত হওয়ার পরেই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের দিকে যেসব জেলা নাট্যচর্চায় (নাটক রচনা ও নাট্যাভিনয়ে) সাড়া দিয়ে বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করে তার মধ্যে দিনাজপুর জেলা ছিল অন্যতম। মোটকথা কলকাতার পরে সাধারণ নাট্যশালা পর্যায়ক্রমে নির্মিত হতে শুরু করে, যথা বরিশালে (১৮৫৬খ্রি:), যশোরে (১৮৫৬ খ্রি:), এরপর ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা (১৮৭২খ্রি:) রংপুর (১৮৯১খ্রি:) এর পরবর্তী পর্যায়ে প্রথম ও উল্লেখযোগ্য ছিল বৃহত্তর বা অবিভক্ত দিনাজপুর জেলা তথা দিনাজপুর সদর। সাধারণ নাট্যশালায় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকভাবে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলা ঐতিহ্যমণ্ডিত নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলায় ইংরেজ অধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এই দিনাজপুরে যখন ইংরেজ অধিকার স্থাপিত হয় এবং ইংরেজ অধিকারের ফলে সাবেক মুঘল আমলের রাজধানী ঘোড়াঘাটের পরিবর্তে দিনাজপুর শহরের রাজবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় তারা একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র গড়ে তোলেন, যা ইস্টেশন

নামে পরিচিত। প্রথম অবস্থায় উত্তরবঙ্গে একমাত্র স্টেশন ছিল দিনাজপুরে এবং প্রশাসনিক কাজের সুবাদে সেখানে শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ সাহেবরা আনাগোনা করতে শুরু করেন। কলকাতা থেকে দূরবর্তী দিনাজপুর শহরে শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ সাহেবরা বড়ই দুঃসহ ও নিরানন্দের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করতেন। এইরূপ অবস্থায় তারা নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের উপায় হিসেবে নিজস্ব সমাজ স্থাপন করে 'ইস্টেশন ক্লাব' এ বিনোদনের জন্য ইউরোপীয় পদ্ধতিতে পান ভোজন ও নাচগানের চর্চার সঙ্গে আর একটি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ছিল ইংরেজী নাট্যাভিনয়ের। তাই ক্লাবের মাঠে কিংবা সাহেবী পাড়ায় অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করে বিলেতী নাট্যাভিনয় মাঝে প্রবাসী সাহেবদের ইংরেজী নাট্যাভিনয়ের প্রভাব ক্রমান্বয়ে বাঙালী চিন্তা ও চেতনায় সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। এই প্রভাব থেকে দিনাজপুর জেলা মুক্ত ছিল না। তাই স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে ৭ই ডিসেম্বর দিনাজপুর শহরে ক্ষেত্রীপাড়া মৌজায় অবস্থিত রথের মাঠে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করে 'জয়দ্রথ' নামে একটি নাটক বেশ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। দিনাজপুরের নাটকের ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম নাটক। মোটকথা দিনাজপুর শহরের প্রসেনিয়াম মূলক ইউরোপীয় ধারায় নাট্যচর্চার সূচনা হয়েছিল ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে ব্রিটিশ শাসনের কেন্দ্র কলকাতা থেকে কোম্পানীর ব্রিটিশ অফিসারদের মাধ্যমে। এমনকি এতঞ্চলের জমিদার শ্রেণী ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত হওয়ায় সর্বাগ্রে তারা ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিল। এর ফলে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর শহরে অবস্থিত দিনাজপুর রাজবাড়িতে মহারাজা গিরিজানাথ রায়ের উদ্যোগে 'কোহিনুর থিয়েটার কোম্পানী' নামে এক সৌখিন সংস্থার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নাট্যাভিনয় শুরু হয়েছিল। তবে এই নাট্যসংস্থায় অভিজাত অভিনেতা ও রাজা আমন্ত্রিত সম্ভান্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। প্রথম নাট্য সংস্থার স্বল্পকালীন স্থায়িত্বের পরে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে 'ডায়মণ্ড জুবিলি থিয়েটার কোম্পানী' নামে দ্বিতীয় নাট্যসংস্থা গড়ে ওঠে। এই সংস্থা প্রতিষ্ঠায় রাজন্যবর্গের আনুকূল্য থাকলেও শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীও এই নাট্যসংস্থার হাত ধরে নাট্যচর্চায় জড়িয়ে পড়ে। দিনাজপুরে প্রথম নাট্যাভিনয়টি অস্থায়ী মঞ্চে মঞ্চস্থ হওয়ার পর থেকেই স্থায়ী মঞ্চ গঠনের তৎপরতা শুরু হয়। এর ফলে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর শহরে প্রথম স্থায়ী নাট্যমঞ্চ 'ডায়মণ্ড জুবিলি থিয়েটার হল' নির্মিত হয়। সংগঠনের আভ্যন্তরী বিরোধের ফলে 'ডায়মণ্ড জুবিলি ড্রামাটিক ক্লাব' ভেঙ্গে দিনাজপুর শহরের তৃতীয় নাট্যসংস্থা রূপে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর নাট্যসমিতি বিশিষ্ট অভিনেতাবৃন্দের উদ্যোগে নির্মিত হয়। এই নাট্যমঞ্চটি দিনাজপুর শহরের তথা সমগ্র জেলার সুমহান নাট্যচর্চার ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক রূপে পরিগণিত হয়েছিল। কলকাতার নাট্যচর্চায় যখন ক্ল্যাসিক থিয়েটারের স্বর্ণযুগ তখন দিনাজপুরে অ্যামেচার শিল্পীদের দ্বারা নাট্যচর্চার

সবেমাত্র শুরু হয়। তবে এই সব যাত্রাঢঙের শিল্পীদের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের প্রতি একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা ও শিল্পীসুলভ প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা থাকায় এই সময়ে দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার অগ্রগতি উত্তরবঙ্গসহ বাংলার অন্যান্য জেলার তুলনায় পিছিয়ে থাকে নি। মোটকথা দিনাজপুরে নাট্যচর্চার শুরু পর্বে নাট্যাভিনয়ের প্রতি গভীর টান বা আকর্ষণ থাকার ফলে এখানে নাট্যচর্চা পর্বে পর্বে প্রসারতা লাভ করে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছিল। এবং তার ফলে এ জেলায় গড়ে ওঠে স্থায়ী নাট্যশালা, নিয়মিত নাট্যগোষ্ঠী এবং আগ্রহী ও নাট্যোৎসাহী নাট্যামোদী দর্শকসমাজ। দিনাজপুর সদরের নাট্যচর্চার ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের সূত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে বালুরঘাট ও রাগঞ্জ মহকুমার মফস্বল থানা শহর ও এতদ্‌ঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে নাট্যচর্চার আরম্ভ হয়ে বিকাশ লাভ করেছিল।

দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার সার্থকতা হল এই যে, দিনাজপুরের নাট্যাভিনয়ের ধারা শতাধিক বৎসর অতিক্রম করে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ও নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাই এই জেলার নাট্যচর্চাকে আলোচনার সুবিধার্থে আমি দুটি পর্বে ভাগ করে নিয়েছি— প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ও স্বাধীনোত্তর পর্বে দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার অবস্থান ও গতিপ্রকৃতি। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়— অখণ্ড বা অবিভক্ত দিনাজপুর জেলা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের সীমা বিভাজন নীতি অনুসারে দ্বিখণ্ডিত হয়। ফলে পূর্ব অংশ তৎকালের পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়— যাকে কেন্দ্র করে দিনাজপুর জেলার প্রাক্ স্বাধীনোত্তর পর্বের নাট্যচর্চার ধারা ও অবস্থান আবর্তিত হয়েছে। তাই প্রসঙ্গক্রমে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার সদর ও দুই মহকুমা শহর ঠাকুর গাঁ ও বালুরঘাটের নাট্যচর্চার আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই উঠে এসেছে। আর পশ্চিম অংশ মুক্ত হয় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জুলাই বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ মহকুমা নিয়ে, যার নাম হয় পশ্চিম দিনাজপুর জেলা। এবং পরবর্তীতে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ১লা এপ্রিল পশ্চিম দিনাজপুর জেলা পুনরায় বিভক্ত হয় উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর নামে দুটি স্বতন্ত্র জেলারূপে— যাকে কেন্দ্র করে স্বাধীনোত্তর পর্বের দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার অবস্থান ও গতিপ্রকৃতি বিবর্তিত হয়ে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়েছে। তবে সীমানা দ্বিখণ্ডিত হলেও এই জেলাদ্বয়ের নাট্যচর্চার ধারা পূর্বতন নাট্যচর্চার ধারাবাহিকতার প্রবহমান গতিকে আজও বহন করে চলেছে।

তাই উত্তর দিনাজপুর জেলায় সদর শহর রায়গঞ্জে প্রধান ধন্যাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যতীন্দ্রমোহন গোস্বামী কলকাতা ও সদর দিনাজপুরের নাট্যচর্চার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহীত হয়ে বন্দর পাড়ায় স্থায়ী বাসভবনে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে সাময়িকভাবে তৈরী অস্থায়ী মঞ্চে ‘বিজয়া’ নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে প্রথম যে নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন তার ফলে এই উত্তর

দিনাজপুর জেলায় নাট্যচর্চা অবারিত গতিতে সারা জেলায় অতিসত্ত্বর ছড়িয়ে পড়ে এবং বিকশিত হয়ে পরিণতি লাভ করে। মোটকথা এ জেলার নাট্যসংস্কৃতির ভগীরথ যতীন্দ্রমোহন গোস্বামী সৌখিন নাট্যচর্চার মধ্য দিয়ে যে প্রসেনিয়াম ভিত্তিক নাট্যচর্চার নতুন ধারা সূচনা করেছিলেন, সে ধারা বেয়ে এ জেলায় বেশকিছু নাট্যসংস্থা গড়ে ওঠে, যথা— রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট, ছন্দম, বিবেকানন্দ নাট্যচক্র, শিল্পীচক্র, এল.টি.সি প্রভৃতি। এই নাট্যমঞ্চকে কেন্দ্র করে প্রথিতযশা সুদক্ষ অভিনেতা যতীনন্দ্রমোহন গোস্বামী, কল্যাণকুমার গোস্বামী, কামাক্ষ্যা চ্যাটার্জী ও সতীশ গুপ্ত আরও অনেকেই এবং নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটে, যথা— ড. বৃন্দাবন চন্দ্র বাগচী, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত রায় প্রমুখ। এবং তাদের সমবেত নাট্যপ্রয়াসের মধ্য দিয়ে এ জেলার নাট্যচর্চা সমগ্র উত্তরবঙ্গ ছাপিয়ে বৃহত্তর বঙ্গে খ্যাতিলাভ করে মহীয়ান হয়ে উঠেছে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাটের নাট্যমন্দিরকে কেন্দ্র করে যে প্রাচীন ও ঐতিহ্য পূর্ণ নাট্যচর্চার উদ্ভব হয়েছিল, তা উত্তরবঙ্গ সহ সমগ্র বাংলাজুড়ে প্রশংসিত হয়েছিল প্রধানত বাংলা একাঙ্ক নাটকের জনক স্বনামধন্য ও শ্রেষ্ঠ নাট্যকার মন্মথ রায়ের হাত ধরে। তাঁর নাট্যসাহিত্য সৃজন পর্ব শুরু হয়েছিল 'বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে'র পূর্ব নামে পরিচিত 'এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ড্রামাটিক ক্লাব' নাট্যমঞ্চকে কেন্দ্র করে। মন্মথ রায় এই নাট্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তিনি বালুরঘাট থেকে পড়াশুনার সুবাদে বাইরে থাকলেও বালুরঘাটের নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিলেন। তাই ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে স্কটিশচার্চ কলেজে বিএ পড়ার সময় 'বঙ্গে মুসলমান' নামে একটি পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক লেখেন এবং এই নাটকটি ভ্যাকেশন ক্লাবের প্রযোজনায় এবং তাঁর পরিচালনায় এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ড্রামাটিক হলে মঞ্চস্থ হয়। কিন্তু নাটক এত দীর্ঘ ছিল যে, পঞ্চাঙ্ক নাটকের অভিনয়রীতি মেনে রাত দশটায় অভিনয় শুরু হয়ে পরের দিন সূর্য উদিত হলে শেষ হয়। মোটকথা তাঁর পঞ্চাঙ্ক নাটক 'বঙ্গে মুসলমান' নিষ্ফল প্রয়াসে পরিণত হওয়ায় মন্মথ রায় নাটক লেখার রীতি উপলব্ধি করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, অল্প সময়ের মধ্যে ছোট একাঙ্কিকা লিখে দর্শকের মন জয় করতে হবে। অর্থাৎ তাঁর 'এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ড্রামাটিক ক্লাব' থেকেই প্রকৃত শিক্ষা শুরু হয়। এ ঘটনাটিই ছিল তাঁর বাংলা নাটকের প্রথম একাঙ্ক নাট্যকার রূপে গড়ে ওঠার প্রথম সার্থক পদক্ষেপ। মোটকথা এই জেলার বালুরঘাট শহরের নাট্যচর্চার সুবাদে তাঁর যুগান্তকারী নাট্যপ্রতিভার উন্মেষ হয় এবং বিকাশিত হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, মন্মথ রায়ের নাট্যপ্রতিভার গুণে এবং এ জেলায় নাট্যমন্দিরের পাশাপাশি ত্রিশূল, তরুণতীর্থ, ত্রিতীর্থ, তূণীর, নাট্যতীর্থ ও নাট্যকর্মী প্রভৃতি নাট্যমঞ্চকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু বিশিষ্ট ও খ্যাতনামা নাট্যকার যথা— শিবপ্রসাদ কর, নীহার ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু তালুকদার, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়,

জিষ্ণু নিয়োগী প্রভৃতি নাট্যকারের নাট্যসৃজন পর্বের মাধ্যমে এ জেলার নাট্যচর্চা চিরন্তন পুণ্যতীর্থের খ্যাতি লাভ করে এবং জেলার এই নাট্যচর্চার (নাট্যরচনা ও নাট্যাভিনয়) ঐতিহ্যবাহী ধারা বেয়ে ক্রমশ অগ্রগতির মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ রূপে পরিণতি লাভ করে এবং সারা বাংলাজুড়ে সুউচ্চ প্রশংসার মধ্য দিয়ে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে স্বমহিমায় বিরাজমান। সুতরাং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চা প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নাট্যচর্চার মাধ্যমে ক্রমশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। এবং সমগ্র বাংলাব্যাপী স্বীকৃতি ও পরিচিতি লাভের মধ্য দিয়ে ব্যাপকতর ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে সারসন্ধানী নাট-সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রন্থগুলিতে কোন বিবরণ পাইনি। এই মফস্বল কেন্দ্রিক ধারাবাহিক নাট্যচর্চার ধারার দিকে তাকালে দেখা যাবে তা বাংলা নাটক ও নাট্যচর্চার মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত। এমনকি সমগ্র বাংলার নাট্যচর্চায় অবস্থান ও গতিপ্রকৃতি নির্ধারণের জন্য জেলার নাট্যচর্চার শুরু থেকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে রচিত নাটক ও নাট্যচর্চার ধারাকে বাদ দিয়ে বাংলা নাটকের ইতিহাসকে ভাবা যায় না। শুধু তাই নয়, এই মফস্বল কেন্দ্রিক নাট্যচর্চার-প্রবহমান ধারার আলোচনা না থাকলে তা হয়তো বিস্মৃতির অতলান্তে গভীরে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমি বাংলা নাট্য সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ নাট্যানুরাগী হিসেবে জেলার এই ঐতিহ্যবাহী নাট্যচর্চার ধারাকে গবেষণা অভিসন্দর্ভে অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরার প্রয়াস করেছি।

তথ্যসূত্র :

১. ড. বিষ্ণু বসু : ‘বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটার : ১৭৯৫-১৯৪৪’, ব্রাত্য বসু (সম্পাদিত), বিষ্ণু বসু প্রবন্ধ সমগ্র, পুনশ্চ, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০১১, পৃ. ২০৯

২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ১৭৯৫-১৮৭৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-০৬, সপ্তম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪০৫, পৃ. ২৩